Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020160


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020160

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228020160 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jannatul Ferdous

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**জান্নাতুল ফেরদৌস**

আইডিঃ 228020160

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

ভূমিকা ....................................................................................................7

মুসলিম উম্মাহর প্রধান ৭ বৈশিষ্ট্য ....................................................................9

উম্মতের জন্য নবিজীর ভালোবাসা কেমন ছিল? ...........................................14

সোনালি যুগে মুসলমানদের বিজয়রহস্য:: ......................................................21

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের স্বীকারোক্তি : ....................................................22

জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিতের স্পষ্ট ভাষণ:: ....................................................23

পাদ্রির কাছে গুপ্তচরের স্বীকারোক্তি এবং পাদ্রির অভিব্যক্তি : .........................24

মুসলমানদের ব্যাপারে চীন সম্রাটের অভিব্যক্তি : ..........................................25

বিরোধিতার মূল কারণ : ...............................................................................26

ইসলাম কি এই যুগে অচল ? ..........................................................................28

উম্মাহের অধঃপতনের কারণ : .......................................................................29

ধর্ম বিরোধিতা করা : ....................................................................................31

ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ ...............................................................................31

শান্তির একমাত্র পথ ......................................................................................32

মুসলিম উম্মার সংকীর্ণ দৃষ্টি ও .......................................................................33

নিরুৎসাহিতা .................................................................................................33

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ .............................................................................34

দ্বিতীয় লক্ষণ: শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা ...............................................35

তৃতীয় লক্ষণ: দ্বীন প্রচারে অলসতা ...............................................................35

বিপর্যয়ের কারণ সমূহ: .................................................................................36

ক. অভ্যন্তরীণ কারণ সমূহ: ...........................................................................36

দ্বিতীয় কারণ: জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ..............................................................36

তৃতীয় কারণ: বিপদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকা....................................................37

পঞ্চম কারণ:আপন শক্তি কাজে না লাগানো....................................................38

প্রথম কারণ: শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা ...............................................39

দ্বিতীয় কারণ: সবকিছু পশ্চিমার লেন্সে দেখতে পছন্দ করা..................................39

খিলাফায়ে রাশিদিনের সময় খলিফাদের দায়িত্ব:...............................................40

ঈমানী দুর্বলতা ....................................................................................44

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ছেড়ে দেওয়া:.........................45

পশ্চিমার রীতিনীতি অনুসরণ করা............................................................47

মুসলিম উম্মার অধঃপতন থেকে উত্তরণের উপায় ...........................................49

উপসংহার:..........................................................................................53

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য । আমরা তার কাছেই আশ্রয় চাই এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তার ওপরে ভরসা করি। নিজের মন্দ কাজ থেকে তার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।

মুসলিম জাতি কেন এমন হলো? এর কারণ কি? কিভাবে তাদের অতীতের বোনাবলী কে বর্তমানের জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায়? প্রায় ৫০ বছর ধরে এই অপরিহার্য প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা চলছে। ইসলামী সভা সম্মেলন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ প্রশ্নগুলো উত্তর দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর দু চারটে ছোট বড় বইও এই প্রশ্নের জবাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক দৈনিক পত্রিকা এবং জামে মসজিদের সাপ্তাহিক খুতবাতেও এই প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই একটা কঠিন ধর্মীয় সংকটে আবর্তিত হচ্ছে।

তাদের বক্তব্য হলো :"ধর্ম কি মানব জীবনের জন্য সত্যিই অপরিহার্য? ধর্ম কি মানুষের জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন?-----না এটা তাদের ব্যক্তিগত রুচি বা ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ব্যাপারে যে, কেউ এটা গ্রহণ করেছে, আবার কেউ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে ধর্মকে মানা অথবা না মানার কারণে মানুষের কার্যকলাপ তেমন কোন পার্থক্য পরিণত হয় না? আর আমরা মানুষের যে আচরণ ও কর্মতৎপরতাকে "কুফর" বা ঈমান নামে অভিহিত করেই বাস্তবতার নিরিখে তাতে কোন তফাৎ নেই?

তারা যখন ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলে তখন তাদের এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তখন তাদেরকে বলা হয় ইসলাম শুধু কিছু প্রত্যয় ও আকিদার নাম নয়। শুধু আধ্যাত্মিক পবিত্রতা বা মানুষের

কল্যাণমূলক শিষ্টাচার বা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা হচ্ছে এমন একটি সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি সুবিচার ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন আদর্শ, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন কানুন একটি বিশেষ জীবন আদর্শ এবং দৈহিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের সুষ্ঠু বিধান। আর এই সব কিছু উহার মৌল বিশ্বাস এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা থেকে উৎসারিত তখন এরা খুবই বিব্রত ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কেননা তাদের একমাত্র বক্তব্য হলো ইসলাম বহু পূর্বেই উহার সূর্য ও কল্যাণের ভূমিকা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে এ কারণে যখনই তাদেরকে বলা হয় ইসলাম কোন মৃত ধর্মের নাম নয় বরং উহা এক অপরাজয় দুর্বার শক্তি, পাতায় পল্লবে, ফলে ফুলে সুশোভিত এক জীবন পদ্ধতি যাতে কার্যকর রয়েছে এমন শক্তিশালী উপাদান যার দৃষ্টান্ত না সমাজতন্ত্র পেশ করতে পেরেছে, না সাম্যবাদ উহার কল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে, না অন্য কোন মতবাদ উহার বিকল্প তুলে ধরতে পেরেছে তখন তারা অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করতে থাকেন:" আপনারা কি সেই ধর্ম সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলেছেন যা দাস প্রথা, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদকে সমর্থন করে?--যা নারীকে পুরুষের অর্ধেক বলে মনে করে এবং তাকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখে দেয়?-যা পাথর মেরে মেরে মানুষ হত্যা করে, হাত পা কেটে ফেলা এবং করা লাগাবার নেই পাশবিক শাস্তির বিধান দেয়?--যা উহার অনুসারীদেরকে দান-খয়রাতের পয়সা দিয়ে জীবন যাপন করতে শিখায়?--যা তাদেরকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয় যাতে করে কিছু লোক অন্যদের ধন-সম্পদ শোষণ করতে সক্ষম হয়?---যা শ্রমিকদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কোন নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না?--আর যে ইসলাম সম্পর্কে আপনারা এটা ওটা বলেছেন তা কি আপনারা নিজেরা পালন করতে থাকেন? এর উন্নতি বিধান ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ তো

দূরের কথা আমাদের দৃষ্টিতে এর অস্তিত্বই এখন চারদিক থেকে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

## মুসলিম উম্মাহর প্রধান ৭ বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই এ উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের অনেক বৈশিষ্ট্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)
১. আল্লাহর জন্য নিবেদিত : একজন মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর জীবনের সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী, আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, ইবাদত ও আমার জীবন-মৃত্যু সব কিছু উভয় জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।' (সুরা আনআম, আয়াত : ১৬২)

২. সহজ পন্থা অবলম্বন : মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য জীবনব্যবস্থাকে সহজ করেছেন। আর জীবনযাপনে তাদের সহজ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।
ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে যা সহজ তাই চান, তিনি তোমাদের জন্য যা কঠিন তা চান না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ‘আল্লাহ কারো ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যে নেই, তার ভালো কাজ তার জন্য হবে, তার মন্দ কাজের প্রতিফলও তার জন্য হবে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

৩. ইসলামের আহ্বান : ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করা মুসলিম জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং ভালো কাজের দিকে মানুষকে ডাকা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাও মুসলিমের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে নবী, আপনি বলুন, হে মানবসমাজ, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

৪. একতাবোধ : একতাবোধ মুসলিম জাতির আরেক বৈশিষ্ট্য। জাতি, বর্ণ, শ্রেণি-স্তর সবাইকে নিয়ে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে। তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণিবৈষম্য বা বিরোধ-বিভক্তি থাকবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘এবং তোমাদের এই যে জাতি তা তো একই জাতি, আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় করো।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫২)

৫. সহানুভূতিশীল : পরস্পরের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি মুসলিমদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর ও পরস্পরের প্রতি সহাভূতিশীল।’ (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯)

৬. যেকোনো স্থানে নামাজ আদায় : মুসলিম উম্মাহর জন্য জমিনকে পবিত্র ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়, যা আমার আগে কোনো

নবীকে দেওয়া হয়নি। আমাকে ভীতির মাধ্যমে এক মাস ভ্রমণের সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য পুরো জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র ভূমি করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের সবাই যেন নামাজের সময় হলে তা আদায় করে। আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আগেকার সময় একজনকে একটি গোত্রের কাছে পাঠানো হতো, আমাকে পুরো মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাকে (কিয়ামতের দিন) সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৩৮)

৭. সর্বজনীনতা : ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান। সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলামের আগমন হয়েছে। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়, যা আমার আগে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি।...আগেকার সময় একজনকে একটি গোত্রের কাছে পাঠানো হতো, আমাকে পুরো মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাকে (কিয়ামতের দিন) সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫২১)

আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিনকে পূর্ণাঙ্গ করেছি, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বিন হিসেবে মনোনীত করেছি।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩)

মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.**

**অনুবাদ : ইবনু আব্বাস রযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ভুল করা, ভুলে যাওয়া ও জবরদস্তিমূলক কাজের শাস্তি ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[1]**

ব্যাখ্যা : মুসলিম উম্মাহর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা বহু জাতি-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। তিনি প্রত্যেক জাতি ও গোত্রকে অবস্থান ও মর্যাদাগত ভিন্নতা দান করেছেন আর শেষ নবীর উম্মতের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রশংসায় বলেন, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারো এবং যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারেন' (আল-বাক্বারা, ২/১৪৩)।

বর্ণিত প্রমাণের আলোকে মুসলিম উম্মাহ সমগ্র পৃথিবীতে কর্তৃত্বের আসনে থাকার কথা। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস তাদের হাতে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তাকে আমি সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছি' (আত-তীন, ৯৫/৪-৫)। অর্থাৎ মানুষকে সুন্দর আকৃতি, গঠন ও অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের অর্থ এটা নয় যে, মানুষ জন্মগতভাবে আদর্শবান হয়ে জন্ম নিবে। প্রকৃত আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য তাকে সাধনা করতে হবে ও চেষ্টা করতে হবে। পাপ থেকে বিরত

থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সেই সফলকাম' (আশ-শামস, ৯১/৯)।

পূর্ববর্তী উম্মতকে তাদের ভুলের জন্য জবাবদিহি করতে হতো, তাদেরকে প্রত্যেক কাজের জন্য হিসাব দিতে হতো, অজ্ঞতা অথবা ভুলবশত কোনো অন্যায় সংঘটিত হলে তাদের জন্য সুপারিশের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের সংঘটিত ভুলগুলো বিনা হিসাবে ছেড়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ভুলবশত কোনো পাপ সংঘটিত হলে বা ভুলে কোনো অন্যায় করে ফেললে বা জোরপূর্বক কোনো কাজ করতে বাধ্য হলে, এই উম্মতের জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ উম্মতের প্রতি বিশেষ রহমত। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! আমরা যদি ভুলবশত কোনো কাজ করি বা ভুলে যাই আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যেমন পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন আর আপনি আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যা পালনের ক্ষমতা আমাদের নেই' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'ভুলবশত কোনো কিছু করলে তোমরা গোনাহগার হবে না, তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করে তবে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহশীল, দয়ালু' (আল-আহযাব, ৩৩/৫)।

আলোচ্য হাদীছটি শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উপর থেকে ভুলত্রুটি ইত্যাদির শাস্তি উঠিয়ে নেওয়ার অন্যতম প্রমাণ। হাদীছটি শরীআতের অনেক বিধিবিধানকে শামিল করে। যেমন ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'হাদীছটি শরীআতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মাসআলা-মাসায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে'।[2] এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো

একত্রিত করলে দেখা যায় হাদীছটি শরীআতের অর্ধেক মাসআলা-মাসায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উম্মতের জন্য নবিজীর ভালোবাসা কেমন ছিল?

দরদি নবি, মায়ার নবি হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাহীন। উম্মতের প্রতি প্রিয় নবির ভালোবাসা পরিমাপ করে শেষ করা যাবে না। যে কারণে মহান আল্লাহ এভাবে আয়াত নাজিল করেছেন-
لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ عَزِيۡزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيۡصٌ عَلَيۡكُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসুল এসেছেন; (তোমাদের জন্য তাঁর মায়া এতইবেশি যে) তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার কাছে খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা তাওবা : আয়াত ১২৮)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের জন্য কতবেশি দরদি ছিলেন। কেউ কোনো বিষয়ে কষ্ট পেলেই তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে-

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর তার ইহসান তথা দয়া-মায়া ও ভালোবাসার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই সমগোত্রীয় এবং তোমাদেরই সমভাষার লোককে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) প্রেরণ করেছেন।' (ইবনে কাসির)

কোরআনের এ আয়াতটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হজরত জাফর ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

'আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন যাকে আমরা চিনি, তার বংশ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। তার ভেতর ও বাহির সম্পর্কে, সত্যবাদিতা, আমানতদারী সম্পর্কেও আমরা জানি।' (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরও বলেছেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সৃষ্টির উপর (শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান) বিশেষত মুমিনদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল।'

উম্মতের প্রতি নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ছিল অগাধ। সব সময় তাঁর আওয়াজই ছিল- 'উম্মাতি, উম্মাতি। সব সময় তিনি উম্মতের গুনাহ মাফে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। উম্মতের ভালোবাসার নমুনা ওঠে এসেছে হাদিসের একাধিক বর্ণনায়। তাহলো-

১. প্রত্যেক নামাজে উম্মতের জন্য দোয়া করতেন বিশ্বনবি

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর প্রসন্ন দেখলে আমি বলতাম- হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।' তিনি বলতেন- 'হে আল্লাহ! আপনি আয়েশার আগের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্যের সব গুনাহ ক্ষমা করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেসে নিজের কোলে মাথা নিচু করে ফেলতেন। তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-

'আমার দোয়াতে কি তুমি আনন্দিত হয়েছ?'

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এটা কেমন কথা, আপনার দোয়ায় আমি আনন্দিত হব না?'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'আল্লাহর শপথ, এভাবেই আমি প্রত্যেক নামাজের পর আমার উম্মতের জন্য আমি দোয়া করি।' (ইবনে হিব্বান)

২. মানুষকে বাঁচানোর চিন্তা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের ক্ষতি হবে এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তা করতেন। উম্মতকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে তিনি সব সময় আমল-উপদেশসহ সমস্যা সমাধানের চিন্তা-ভাবনায় নিয়োজিত থাকতেন। আপনজন কিংবা সম্মানিত কোনো ব্যক্তি ঈমান না আনলে তাঁর চিন্তা-পেরেশানি আরও বেড়ে যেত। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছেন এভাবে-

'ওই সব লোক ঈমান আনছে না, এ কারণে কি তাদের চিন্তায় ও পেরেশানিতে আপনি নিজেকে শেষ করে দেবেন।' (সুরা শুআরা : আয়াত ৩)

৩. উম্মতের প্রতি বিশ্বনবির ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  ওয়া সাল্লাম উম্মতের প্রতি বিশেষ দয়াশীল ছিলেন। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় যেসব উম্মতের জন্ম হয়নি অর্থাৎ অনাগত উম্মত; তাদের প্রতিও ছিল বিশ্বনবির অগাধ ভালেবাসা। কেননা তারা না দেখেই বিশ্বনবির রেসালাতের স্বীকৃতি দেবে। হাদিসে এসেছে-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করছে। সাহাবিরা বললেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবি তথা সঙ্গি। আমার ভাই হলো, যারা আমার ওপর ঈমান আনবে, কিন্তু আমাকে দেখবে না।’ (মুসনাদে আহমাদ)

৪. উম্মতের জন্য বিশ্বনবির চাওয়া

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথা তেলাওয়াত করলেন-

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضۡلَلۡنَ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنۡ تَبِعَنِىۡ فَاِنَّهٗ مِنِّىۡ ۚ وَ مَنۡ عَصَانِىۡ فَاِنَّكَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

হে আমার রব! তারা (এসব প্রতিমা) বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য

হলে (তাদের ব্যাপারেও) তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৬)

اِنۡ تُعَذِّبۡهُمۡ فَاِنَّهُمۡ عِبَادُکَ ۚ وَ اِنۡ تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَاِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

'তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সুরা মায়েদা : আয়াত ১১৮)

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাত তুলে বলেন-

'হে আল্লাহ, আমার উম্মত! আমার উম্মত!'

আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিবরিল! মুহাম্মদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন- আপনি কাঁদছেন কেন?' মহান আল্লাহ সব কিছুই অবগত আছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে জিজ্ঞাসা করলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের কথা বললেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে জিবরিল! তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে বলো, আমি শিগগির আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আমি আপনাকে কষ্ট দেব না।' (মুসলিম)

৫. উম্মতের জন্য বিশ্বনবির কোরবানি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে আলাদা পশু কোরবানি করতেন। এ ছিল উম্মতের জন্য রাসুলুল্লাহর ভালোবাসা। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরবানির সময় দুইটি মোটা-তাজা শিংবিশিষ্ট দুম্বা ক্রয় করতেন। নামাজ আদায় করে খুতবা দিতেন। এরপর তিনি নামাজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেই একটি দুম্বা নিয়ে আসা হতো। তা তিনি নিজ হাতে কোরবানি করতেন আর বলতেন-

‘হে আল্লাহ! এটা আমার পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে, যারা আপনার তাওহিদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আমার রেসালাত পৌঁছে দেওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে।’ (মুসনাদে আহমাদ)

৬.অন্যান্য আমলে উম্মতের প্রতি ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বারবার গিয়ে ৫০ ওয়াক্ত নামাজকে ৫ ওয়াক্তে নির্ধারণে সুপারিশ ও বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল মেওয়াক করাকে বাধ্যতামূলক করেননি। বরং সুন্নাত আমলে রেখেছেন; কারণ বাধ্যতামুলক করলে এসব আমল পালন না করলেই গুনাহগার হতে হতো।

ইসলামের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের অধিক ফজিলত থাকা সত্ত্বেও উম্মতের প্রতি ইহসান করতেই তিনি সব যুগ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যদি তিনি সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন হয়তো তা উম্মতের জন্য ফরজ হয়ে যেতো। তিনি সব সময় উম্মতের কষ্ট কমানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

এ কারণেই কোরআনের একাধিক আয়াতে উম্মতের প্রতি প্রিয় নবির ভালোবাসার কথা ওঠে এসেছে-

১.لَقَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیۡصٌ عَلَیۡکُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রাসুল এসেছেন; (তোমাদের জন্য তাঁর মায়া এতইবেশি যে) তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার কাছে খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা তাওবা : আয়াত ১২৮)

২.اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَ اَزۡوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمۡ ؕ وَ اُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلٰی بِبَعۡضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُهٰجِرِیۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِکُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্বাসীদের কাছে তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারাই পরস্পরের খুবই কাছাকাছি।] তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও (তাহলে তা করতে পার)। এ কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।' (সুরা আহজাব : আয়াত ৬)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া। কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করা। রাসুলের ভালোবাসা অর্জন করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করে সঠিক আশেকে রাসুল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সোনালি যুগে মুসলমানদের বিজয়রহস্য::

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী—যদি মুমিন হয়ে থাকো।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯)

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এই মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বিনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই ফাসিক।

প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বিনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই ফাসিক।

' (সুরা : নূর, আয়াত : ৫৫)

কোরআনুল কারিমের এই শাশ্বত বাণীর বাস্তবতা ও সত্যতা ফুটে উঠেছে অনেক অমুসলিম নেতা ও বড় বড় মনীষীর মুখ থেকেও, যাঁরা কখনো কোরআন ছুঁয়েও দেখেননি। আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে এমন কিছু উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করছি, যেগুলোর মধ্যে অমুসলিম মনীষীরা মুসলিমদের ঈমান ও আমলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন এবং এটিকেই মুসলিমদের শক্তির উৎস ও তাদের বিজয়ের রহস্য বলে অভিহিত করেছেন।

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের স্বীকারোক্তি :

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের বিজয়ের ধারাবাহিকতা ও রোম সেনাদের পরাজয়ের চিত্র দেখে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর বাহিনীপ্রধানদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের বিনাশ হোক! তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বারবার পরাজিত হচ্ছ, তারা কি তোমাদের মতো মানুষ নয়? তারা বলল, অবশ্যই। সম্রাট বললেন, সংখ্যায় তারা বেশি, নাকি তোমরা? তারা বলল, সব যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বেশি ছিলাম।

সম্রাট বলেন, তাহলে তোমরা বারবার পরাজিত হচ্ছ কেন? তখন তাদের বয়োবৃদ্ধ এক সেনা কর্মকর্তা বলল, কারণ তারা রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে আর দিনের বেলা রোজা রাখে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয়, একে অন্যের প্রতি ইনসাফ করে। আর এর বিপরীতে আমরা মদ পান করি, ব্যভিচার করি, অন্যায় করি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি, জুলুম করি, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ থেকে মানুষদের বিরত রাখি এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করি। ’ তখন সম্রাট হেরাক্লিয়াস বললেন, তুমি আমাকে সত্য বলেছ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২০)

অন্য একটি ঘটনা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর নগরী শাম থেকে পরাজিত হয়ে অবশেষে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে অবস্থান করলেন এবং সেখানে রাজত্ব গড়ে তুললেন।

একদা তাঁর এক অনুচর মুসলিমদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি  বললেন : এই জাতি সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো। ওই ব্যক্তি বলল, আমি তাদের এমন বিবরণ দেব, যেন আপনি তাদের স্বচক্ষে দেখছেন—তারা দিনের বেলা অশ্বারোহী বীর আর রাতের অন্ধকারে দুনিয়াত্যাগী ইবাদতগোজার, জিনিসের মূল্য পরিশোধ করেই তারা ভোগ করে, সালাম দিয়ে প্রবেশ করে, যুদ্ধের ময়দানে অবিচল। সম্রাট হেরাক্লিয়াস তা শুনে বললেন, যদি তুমি সত্য বলে থাকো, তাহলে তো তারা আমার পদতলের এই জায়গাটুকুও দখল করে নেবে। ' (তারিখে তাবারি : ৩/৬০৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৬২)

জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিতের স্পষ্ট ভাষণ**:**

এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিক বিজয় ও রোম সেনাদের পরাজয়ের চিত্র দেখে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর সভাসদদের সামনে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন জনৈক পুরোহিত তাঁকে বলল : হে মহামান্য সম্রাট! এর কারণ হলো, আমাদের জাতি তাদের দ্বিন-ধর্মকে পরিবর্তন করে ফেলেছে, ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে, পরস্পর জুলুমে লিপ্ত, এ জাতির মধ্যে এমন কেউ নেই যে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দেবে, এ জাতির মধ্যে কোনো ন্যায়-ইনসাফ ও দয়া নেই, ইবাদত-বন্দেগি করে না, নামাজের সময় বিনষ্ট করে, সুদ গ্রহণ করে, ব্যভিচারে লিপ্ত এবং এদের মধ্যে গুনাহ ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে।

আর এই আরবরা তাদের প্রভুর আদেশ মান্যকারী, তাদের দ্বিনের অনুসারী, তারা রাতে দুনিয়াত্যাগী ইবাদতগোজার আর দিনের বেলা রোজাদার, তাদের রবের জিকিরে এবং তাদের নবীর ওপর দরুদ পাঠে তারা গাফিল হয় না, আর তাদের মধ্যে কোনো জুলুম-অবিচার নেই, তারা একে অন্যের ওপর অহংকার করে না। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো সততা, আর তাদের পোশাক হলো ইবাদত। তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করলে ফিরে যায় না, আর আমরা আক্রমণ করলে পালায় না। তাদের বিশ্বাস হলো, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী। ' (ফুতুহুশ শাম, ওয়াকেদি : ১/১৪৯)

পাদ্রির কাছে গুপ্তচরের স্বীকারোক্তি এবং পাদ্রির অভিব্যক্তি :

যখন সাহাবায়ে কেরাম জর্দানের নিকটবর্তী এলাকায় অবতরণ করলেন, তখন দামেস্কের জনৈক পাদ্রি তাঁদের খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দুজন আরবিভাষী খ্রিস্টানকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠালেন। তারা দুজন গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের দিন-রাতের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে বলল, আমি কিছু প্রখর লোকের কাছ থেকে এসেছি, যারা উত্তম ঘোড়ায় আরোহণ করে, রাতের অন্ধকারে তারা দুনিয়াত্যাগী ইবাদতগোজার, আর দিনের বেলা অশ্বারোহী বীর, তীরের পালক লাগাচ্ছে এবং বর্শা ধার দিচ্ছে। আপনি যদি পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের কোরআন তিলাওয়াত ও জিকিরের আওয়াজের কারণে তারা তা শুনবে না। তখন ওই পাদ্রি তাঁর সহচরদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের কাছে এমন এক জাতি এসে পৌঁছেছে, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। ' (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২০)

## মুসলমানদের ব্যাপারে চীন সম্রাটের অভিব্যক্তি :

পারস্য সম্রাট কিসরা যখন পরাজিত হয়ে দূরদেশে পালিয়ে গিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তাঁর কয়েকজন সহচরের সঙ্গে তাঁর করণীয় বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন, সম্রাটের ইচ্ছা ছিল যে চীন সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁর থেকে সৈন্য-সামন্ত ও সাহায্য নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবেন। তখন জনৈক বুদ্ধিমান সহচর তাঁকে এই পরামর্শ দিল যে আপনি তা না করে বরং এই আরব লোকগুলোর মধ্যে দ্বিনদারি ও বিশ্বস্ততা আছে, আপনি চাইলে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বচ্ছন্দে এখানে তাদের পার্শ্ববর্তী দেশে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু কিসরার এই পরামর্শ পছন্দ হয়নি। তাই তিনি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন করলেন। তখন চীন সম্রাট ওই দূতের কাছে বিশ্বজয়ী মুসলমানদের সম্পর্কে খবরাখবর নিলেন। তখন ওই দূত তাঁকে মুসলিমদের নামাজ, ইবাদত, যুদ্ধ, অশ্বারোহণসহ বিস্তারিত বর্ণনা করলেন।

চীন সম্রাট সব খবর শুনে কিসরার কাছে এই মর্মে লিখে পাঠালেন— "আমি আপনার কাছে এমন বিশাল সৈন্যবহর পাঠাতেও আপত্তি নেই, যার শুরু হবে 'মারব' আর শেষ প্রান্ত হবে চীনে, কিন্তু এ জাতি যার বিবরণ আপনার প্রেরিত দূত আমাকে দিয়েছে, যত দিন তারা এই গুণে গুণান্বিত থাকবে যার বর্ণনা আমি দূত থেকে শুনেছি, তারা যদি পর্বতের সঙ্গেও টক্কর দেয় তাহলে তা-ও বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আমি যদি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসি তারা আমাকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অতএব, কল্যাণ এতেই আছে যে আপনি তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে নিরাপদে থাকুন। ' কিন্তু কিসরা তা না করে কুল-কিনারা না পেয়ে দেশে দেশে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এর দুই বছর পর তিনি নিহত হন। (তারিখে তাবারি : ৪/১৭২, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৪৫

## বিরোধিতার মূল কারণ :

আসুন এই সন্দেহবাদে আধুনিক শিক্ষিতদের প্রকৃত পরিচয় আমরা জেনে নেই। পর্যালোচনা করে দেখি তাদের এই সন্দেহ ও সংশয়ের মূল সূত্র উৎস কোথায়? তাদের এই চিন্তা ধারা কি তাদের নিজস্ব ও স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণের ফল, না অন্যদের অন্ধ অনুসরণের ফল?

প্রকৃত অবস্থায় এই যে এরা ইসলামের বিপক্ষে যে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে থাকেন তারা তাদের স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনার ফসল নয় বরং এর া তা অন্যদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। এর মূল উৎস জানতে হলে আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টপাত করতে হবে।

গোটা ইউরোপ যে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল তার নাম ইসলাম ছিল না বরং তা ছিল ইসলাম থেকে ভিন্নতর অন্য একটি ধর্ম। এ কোথাও তারা বলে যায় যে যে অবস্থা ঘটনা বলি ইউরোপদেরকে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুলেছিল তা শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিশ্বের অন্য কোন এলাকায় এর কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। নুনু কল্পে ইসলামী ইতিহাসের এমন কোন অবস্থা ও ঘটনা বলির কোন সন্ধান মিলেনা। এমনকি ভবিষ্যতে এরকম অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ইউরোপের এই অন্ধ অনুসারীরা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই নিজেদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মতে ইসলামকে বর্জন করার একমাত্র কারণ হলো এই যে ইউরোপীয়রা ধর্মের প্রতি রুষ্ট এবং রুষ্ট বলেই উহাকে দেশ থেকে চিরতরে বিদায় দিয়েছে।

ইউরোপের ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষের মূল ছিল ধর্মযাজকদের নির্বুদ্ধিতা। তারা কোন রোগ বিচার বিশ্লেষণ না করেই গ্রিসদের পরিত্যক্ত কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণাকে ধর্মের অঙ্গী ভোগ করে উহাকে পবিত্রতার লেবাস পরিয়ে দেয়। ফলে উক্ত ধারণার অশিক্ষিত ও নিরঙ্কু সত্য বা ধর্মের অস্বীকৃত

বলে বিবেচিত হয়। অতঃপর সুষ্ঠু চিন্তা ও সঠিক গবেষণার মাধ্যমে যখন উক্ত ধারণার ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তাদের চৈতন্য উদয় হলো না বরং জলজ্যান্ত ভুল কেউ নির্ভুল ও অকট্য সত্যরূপে গ্রহণ করার বিধান চালু রাখা হয়। এই পরিবেশ গোটা ইউরোপের গির্জা ও ধর্মযাজকদের মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ম্লান করে দেয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই দন্দকমই এক ধ্বংসাত্মক রোগ গ্রহণ করে এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় জুলুম ও নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এরপর যখন ধর্মযাজকগণ তাদের খোদাই শক্তিকে অবগনীয় নিষ্ঠুর পন্থায় ব্যবহার করতে শুরু করে তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল মানুষের ধর্মের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ধর্মযাজক্য নিজেদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইউরোপবাসীদের সম্মুখে ধর্মের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে তা ছিল অতিশয় জঘন্য বর্বরোচিত।

মোটকথা ধর্ম যোজকদের এই নিষ্পেষণ ও অন্যায় আচরণ ইউরোপের সকল বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষকে অস্থির করে তুলল। তখন তারা এর ও সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে ধর্ম নামধারী এই বিরাট দত্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, হয় তাকে চিরতরে নির্মূল করে দিতে হবে নইলে অন্ততপক্ষে এতোখানি দুর্বল করে দিতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে কাউকে কোনদিন নির্যাতন করতে না পারে এবং নিজের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড দিয়ে একথা প্রমাণ করতে না পারে যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার নামই হচ্ছে ধর্ম।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইউরোপবাসী ও ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক মুসলমান ও ইসলামের মধ্যেও কি সেই রূপ সম্পর্ক বর্তমান? যদি না হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম ও বিজ্ঞানের বই রিতা সম্পর্কে এত হুর হাঙ্গামা কেন? বাস্তব সত্য তো এই যে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। না আজ পর্যন্ত এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলা হয়েছে যা মেনে নিলে ইসলামের কোন সত্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ইসলামে সৌদির ও শাসন

মালে এমন কোন সময় আসেনি যখন বৈজ্ঞানিকগণ পাশবিক অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামী সমগ্র ইতিহাসই আজ আমাদের সামনে বর্তমান। এর বিভিন্ন অধ্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞান, জেতির্বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের বড় বড় পন্ডিত অতীতে হয়েছেন, কিন্তু তাদের এমন একটি ঘটনাও কোথাও কেউ বলতে পারবে না যে অমুককে তারা বৈজ্ঞানিক রায় বা চিন্তা ধারার জন্য নিক্রিত করা হয়েছে। এই মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেউই ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দূরত্ব খুঁজে পাননি। মুসলিম শাসক মন্ডলীয় তথাকথিত ধর্ম যোজকদের ন্যায় বিজ্ঞানীদের কে কখনো শত্রু বলে মনে করেননি এবং করেননি বলে ইসলামের ইতিহাস না কোন বিজ্ঞানী কে পুড়িয়ে মারা হয়েছে না কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছে না কাউকে অন্য রূপের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সত্য কোন লোক ইসলাম ও বিজ্ঞান কে পরস্পর বিরোধী প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এরা ইসলামের কোন জ্ঞান হাসিল না করে ইসলামের দ্রষ্টুটি আবিষ্কার করতে শুরু করেছে বস্তুত সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শিরা উপশিরায় যে তীব্র ফলাফল ঢুকিয়ে দিয়েছে তার ঐ অনিবার্যফল স্বরূপ এরা এ সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে। অথচ এরা কখনো এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে না।

## ইসলাম কি এই যুগে অচল ?

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্য পশ্চাত্যের লোকদেরকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে তাদের সকলের মধ্যেই এই মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে যে বিজ্ঞান ধর্মকে চিরতরে অচল করে দিয়েছে। তোমার কোন কার্যকারিতা এই বর্তমান নেই। প্রখ্যাত মনস্তবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই এই অভিমত পোষণ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক বইয়ের

ধর্মের পুনর্জীবন প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন:" মানুষের জীবন স্পষ্ট রূপেই তিনটি মনস্তাত্ত্বিক যুগ অতিক্রম করে এসেছে। কুসংস্কারের যুগ , ধর্মের যুগ এবং বিজ্ঞানের যুগ। এখন চলছে বিজ্ঞানের যুগ।সুতরাং ধর্মীয় কথাবার্তার এখন কোন অস্তিত্ব নেই। ওরা বাসি হয়ে গেছে উহার মর্যাদা ও মূল্য বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই।

উম্মাহের অধঃপতনের কারণ :

**কোরআনকে ছেড়ে দেওয়া:**

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এ কথা বলতে পারি যে, কুরআনুল কারীম থেকে বিমুখতা বা কুরআন বর্জন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। বরং এটি অধঃপতনের সবচেয়ে মারাত্মক কারণ। আফসোস! আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ এমনকি অল্প-স্বল্প ব্যতীত কুরআন পড়তে জানে না। আবার অনেকে জানলেও নিয়মিত তিলাওয়াত করে না, অপরদিকে যারা একটু-আধটু পড়ে তারাও ভেবে-চিন্তে পড়ে না, তার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না এবং তার নির্দেশিত পথ মেনে চলার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে না। কুরআনুল কারীম থেকে বিমুখতার কতিপয় ধরণ রয়েছে, যেমনটা আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন। যথা:

(১) নিজে কুরআন তিলাওয়াত বর্জন করা এবং কেউ কুরআন তিলাওয়াত করলে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ না করা।

(২) যদিও কুরআন পড়ে এবং তার উপর ঈমান রাখার দাবীও করে কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করে না এবং কুরআনে ঘোষিত হালাল ও হারাম মেনে চলে না। (৩) কুরআনিক বিচার বর্জন করা এবং দ্বীনের মৌলিক

বিষয়াদি ও শাখা-প্রশাখার মীমাংসায় কুরআনের কাছে বিচার প্রার্থনা পরিহার করা।

(৪) কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি বোঝা এবং তার শেষ অবস্থা কত দূর গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে একটুও চিন্তা-গবেষণা না করা এবং কুরআনের মালিক আল্লাহ তা’আলা কুরআন থেকে কী ইচ্ছা পোষণ করেছেন তা জানার চেষ্টা না করা।

(৫) আত্মার সকল রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় কুরআনকে মোটেও কাজে না লাগানো এবং আল্লাহর দেয়া আত্মিক চিকিৎসা বাদ দিয়ে অন্যদের চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া। এগুলোর সবই কিন্তু রাসূল ( (ﷺকর্তৃক তাঁর প্রভুর সমীপে কৃত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَ قَالَ الرَّسُوۡلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوۡمِی اتَّخَذُوۡا ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ مَہۡجُوۡرًا ‘সেদিন রাসূল বলবেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার উম্মাত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল’ (সূরা আল-ফুরক্বান: ৩০)।

সত্যি সত্যিই আজ মুসলিম সমাজের বৃহৎ অংশ কুরআনকে বাদ দিয়ে আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কুরআন বিরোধী নানা বিষয় নিয়ে মেতে আছে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় তারা কুুরআন বিরোধী বিষয় বেছে নিয়েছে। কুরআনের মোকাবেলায় মানব রচিত বই-পুস্তককে প্রাধান্য দেয়, মানুষের বক্তৃতা-ভাষণ শোনে, মানুষের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে, মানুষের সুর দেয়া গান গায়, কিন্তু কুরআন পড়া ও শোনার কথা তারা মোটেও মনে করে না। কুরআনের সঙ্গে যারা এমন আচরণ করবে স্বাভাবিক ভাবেই কুরআনের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হবে, তাদের জীবনে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট বাড়বে, সমস্যাগুলো বড় হয়ে দেখা দেবে, নেমে আসবে অধঃপতনের কালো মেঘ! সুতরাং এই মরণঘাতী ব্যাধি ও বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হিসাবে আমাদের মুসলিম সমাজকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ফিরে আসতে হবে। তারা ইসলামী বিধানকে নিজেদের জীবনে অবশ্য পালনীয়

করে নিবে। তারা বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তারা কুরআনের ভিত্তিতে প্রতিপালিত হবে।

## ধর্ম বিরোধিতা করা :

ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে যে ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের যাবতীয় বিরোধিতার মূল কারণ ছিল ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে তাদের বিরতিহীন সংগ্রাম। এই সংঘর্ষে ধর্মযাজকরা যে কর্মকান্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাতে এরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভাবতে শুরু করে যে ধর্ম হচ্ছে রক্ষণশীলতা বর্বরতা উদ্ভট ধ্যান ধারণা অর্থহীন চিন্তাভাবনা এবং অযৌক্তিক কর্মতৎপরতার সমষ্টি মাত্র। এ কারণেই শরবত কৃষ্ণ পন্থা হলো ধর্মের জ্ঞানকে চিরতরে শেষ করে দেয়া হোক এবং তদস্তলে বিজ্ঞানকে অগ্রসর করে দেয়া হোক তাহলেই বিজ্ঞানের আলোকে মানবতা ও মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষ ও ক্রম বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকা সুযোগ লাভ করবে।

## ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ

ধর্মের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের শত্রুতার মূল কারণ ছিল ইহাই কিন্তু মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক ধর্ম বিরোধীদের অবস্থা হল এই যে, না তারা এই বিরোধিতার মূল কারণ বুঝতে সক্ষম , না পশচাত্য ও প্রাচ্যের অবস্থা ও পরিবেশের পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থক। অথচ ধর্মের বিরোধিতা করতে থাকে নিরলস ভাবে। তাদের এই বিরোধিতা কোন গভীর চিন্তা বা বিচার বিশ্লেষণের ফল নয়। বরং ইউরোপের অন্ধ অনুসরণের বাস্তব ফসল। তাদের নিকট ইউরোপের লোকেরা যে পথ অনুসরণ করেছে তাই হচ্ছে উন্নতি ও সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। তারা যেহেতু ধর্মের পেছনে ছুটে চলে না সেহেতু আমাদেরও কর্তব্য হলো ধর্মের অনুসরণ না করা নইলে লোকেরা আমাদেরকে

রক্ষণশীল কুসংস্কার পন্থী বলে বিদ্রোহ করতে থাকবে। দুর্ভাগ্য যে এরা ভুলে যান যে ধর্মের সাথে শত্রুতার করার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ না অতীতে কোন সময় একমত ছিলেন, না বর্তমানে একমাত্র হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক লোক যোগ্য সংখ্যক চিন্তাবিদ নাস্তিক্যবাদী সভ্যতার ঘর বিরোধী, তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে ধর্ম হলো মানুষের এক অপরিহার্য মনস্তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক প্রয়োজন।

## শান্তির একমাত্র পথ

ধর্ম এবং কেবলমাত্র ধর্মই মানুষকে তার হারানো শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে পারে। পুরা মানুষের অন্তরের সত্যতার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়ে অন্যায় ও স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে আত্মসর্গ করার জন্য উদ্ভূত করে তোলে তাকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় :" যদি সত্যিকার অর্থেই সেও রব এবং প্রকৃত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে বাতিলের দাপট ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূর্তিকে চূর্ণ-বিচনা করে দিতে হবে এবং গোটা বিশ্বে কেবল তোমার প্রভু হুকুম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পথ যত অন্তরায় ও বিপদ আসুক না কেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে।"
আর এজন্য শুধু আখিরাতের পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে আজকের দুনিয়ার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা অন্য কথায় ধর্মের প্রয়োজন নেই কি?

ধর্মকে বাদ দিলে জীবনের অর্থ ও সার্বত্তা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস এই বিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবন নিত্যনতুন অবকাশের পরশ লেগেই যায় এবং আর সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনা দিগন্ত উন্মোচিত হয় অনুভূতির নির্মম শিকারে পরিণত হয়। পরলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে মানুষের সম্ভব

একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সম্পূর্ণরূপী বাদ দেয়া এবং উহাকে অন্ধপ্রোবৃত্তি ও কামনা-বাসনার হাতে ছেড়ে দেয়া । এর ফলে মানুষ প্রবক্তির লালসায় চরিতার্থ করার কাজেই সম্পূর্ণরূপে মশগুল হয়ে যায়।

তখন তার যাবতীয় কর্ম তৎপরতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরাম-আয়েশের যত উপায় উপাদান হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভব আর সবটুকুই সে করবে, আর সে এক্ষেত্রে কেউ তার সাথে ভাগ বসাক তা সে কখনো বরদাস্ত করবে না। বস্তুত এখান থেকে যাবতীয় শক্রুতা ও পাশবিক সংঘর্ষের সূচনা হয়। কেননা যারা পবিত্র দাস তারা এই দুনিয়ার ভালো-মন্দ যেকোন বাধাতেই অপসারিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অধিক হতে অধিকতার স্বার্থ হাসিলের জন্য অস্থির হয়ে যায়। তার মনে কোন উপরস্থ সত্যার ভীতি বলতে কিছুই বর্তমান থাকে না কেননা পূর্ব থেকেই সে বিশ্বাস, এই পৃথিবীর কোন খোদা নেই এবং বিচার করে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার কোন ব্যবস্থাপনাও নেই।

## মুসলিম উম্মার সংকীর্ণ দৃষ্টি ও

## নিরুৎসাহিতা

পরকাল অস্বীকার করার কারণে মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা ভাবনার নিম্নতর স্তরে নেমে যায়। তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণার উৎকর্ষ ও প্রমাণিত বন্ধ হয়ে যায়। তার লক্ষকর্ম পঞ্চা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ক হয়ে দাঁড়ায়। গোটা মানবতাই চিরন্তন গৃহযুদ্ধের এক আক্কায় পরিণত হয়। এমনি করে তার হাতে এতোটুকু সময় থাকে না যে জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এমনি করে তার হাতে এতোটুকু সময় থাকে না যে জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এই নতুন জগতের স্নেহ মমতা সহানুভূতি বা সৌভাগ্যের কোন স্থান থাকে না বস্তুগত আরাম আয়েসের সন্ধান এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ

করার নেশা এ সকল কথা চিন্তা করাই অবকাশ দেয় না এবং দেয় না বলেই জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ এবং মহত্ব সূচক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হতে পারেনা।

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ

কি করে বুঝবেন মুসলিম উম্মাহ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়ের কিছু লক্ষণ আছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো:

**প্রথম লক্ষণ: হতাশায় ভোগা**

মুসলিম উম্মাহ আজ উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশ। যখন আপনি কোন মুসলিমের কাছে পুনর্জাগরণের আশা ব্যক্ত করবেন দেখবেন সে আপনার কাছে হতাশা ব্যক্ত করছে। আসে আশাহত হৃদয়ে আপনাকে কিছু গল্প উদাহরণ শুনিয়ে দিচ্ছেন

হয়তো সে বলবে," তুমি উলু বনে মুক্তা ছড়াচ্ছ, এখানে তোমার কথা শুনতে কেউ আসবে না"। হয়তো কেউ বলবে, তুমি তো ফটো বেলুনে ফু দিচ্ছ। ফুটা  বেলুনের ফুঁ দিয়ে লাভ নেই। তেমনি তোমার কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

অনেকের সাথে তোমার দেখা হয়েছে তাদের মতে শিক্ষার্থীর যেমন আছে অনেক শায়খও আছে। আপনি যদি তাদের কাউকে বলেন আপনি মুসলিমের দিন শিখানোর জন্য কেন কোন শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করছেন না? সে আপনাকে উত্তরে বলবে, কাউকে আমি পাশে পাবো না, কেউ আমার কথা শুনবে না। মূলত সে নিজেকে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

## দ্বিতীয় লক্ষণ: শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা

কিছু মানুষ পাবেন, এরা নিজেদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের সাথে তুলনা করে যারা শেষ করতে তাদের চেয়ে নিচে, আর যারা তাদের চেয়ে ওপরে এরা তাদের লক্ষ্য করেনা। এরা বড় নিম্নতর লোকদের চেয়ে কিছুটা ভালো হওয়ার জন্য আত্মত্যাগ অনুভব করে আর নিজেদের সাফাই গাইতে থাকে।

## তৃতীয় লক্ষণ: দ্বীন প্রচারে অলসতা

পৃথিবীর বুকে দ্বীন প্রচার প্রসারের ব্যাপারে অলসো ও শীতলতা মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ। এ বিপর্যয়ের ফলে পরাজিত দেব দুর্বলতার মধ্যে দিয়ে এবং তাদের কিছু কিছু দলিলের ব্যাখ্যা করার মধ্যে দিয়েও--যে দলিলগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে আগামীতে মুসলমানদের অবস্থা আরো না যোগ হবে আরো দুর্বল হবে এবং ফিতনা ফাসদে দুনিয়া ভরে যাবে।

এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ হল :

১. বুখারীর হাদিস: "অচিরেই এমন হবে মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে মেষপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়া ও অন্য উপত্যকায় আশ্রয় নেবে এবং ফিতনা হতে বাঁচতে সে তার দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেড়াবে"[বুখারী: ২/৯৬১]

এ সমস্ত দলিলের দিকে ঝুঁকে যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর ব্যাখ্যা করে যে এটাই সেই জামানা-যখন ফিতনা বেড়ে যাবে। সুতরাং মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখায় আমাদের জন্য উত্তম।

এই শ্রেণীর মানুষ কখনো অন্য আরেকটি দল নিয়ে আসে। দলিলটি হলো বুখারীর বর্ণনায় আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন,--

"যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করো, পূর্বের সময় থেকে পরের সময় আরো অনিষ্টের হবে।"[বুখারী: ২/১০৪৭]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শায়েখ আলবানী বলেন এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা অন্যান্য হাদিসের আলোকে যখন আমরা হাদিসে বুঝবো তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে জালেম শাসকের সময় শেষে আবারো খেলাফাইল রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিপর্যয়ের কারণ সমূহ:

ক. অভ্যন্তরীণ কারণ সমূহ:

উম্মাহর মাঝে বিরাজমান এই ব্যাধির কারণ গুলো কি? কিছু কারণ আছে অভ্যন্তরীণ যেগুলো আমাদের নিজেদের সৃষ্টি আর কিছু কারণ আছে এমন যেগুলো বাইরে থেকে এসে আমাদের পরিবেশে মিশে গেছে।
অভ্যন্তরীণ কারণ সমূহ::

**প্রথম কারণ; ঈমানী দুর্বলতা**

মুসলিমদের ঈমানের দুর্বলতা। ঈমান যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সাহস হ্রাস পায়। ব্যক্তি তখন আরক্লেশ কষ্ট ও বিপদ-আপদে সহিষ্ণু থাকতে পারে না। দেখা যায় ব্যক্তি তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ক কিছু নেয়, যা তাদের ব্যক্তিত্বকে নিস্তেজ ও বিপর্যস্ত করে দেয়।

দ্বিতীয় কারণ: জিহাদ ছেড়ে দেওয়া

মুসলিমরা পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক অর্থে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন, “যখন তোমরা “ইনা” পদ্ধতিতে কেনাবেচা করবে, গরু লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকাজ সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা

চাপিয়ে দেবেন। এই অপদস্ততো কেউ তোমাদের থেকে অপসারণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের তোমাদের দিনে ফিরে আসবে।"।
[আবু দাউ দ: ৪৯০]
ইনা হলো এক ধরনের কেনাবেচার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হিলার পন্থা অবলম্বন করে সুদ আদান-প্রদান করা হয়। শুটকি এমন কৌশলে গ্রহণ করা হয় যে ব্যাহত মনে হয় এটা তো ব্যবসা।
মুসলিমরা প্রকাশ্যে সুদ নিচ্ছে প্রকাশ্যে সুদ দিচ্ছে। এটিকে কোন প্রকার গুনা মনে করে না।

## তৃতীয় কারণ: বিপদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকা

সম্পূর্ণ দিন মেনে চলার পথে সম্ভাব্য বিপদ-আপদের আশঙ্কা ও ভীতি বিরাজ করে। বিষয়টা যেন এমন তারা ভাবছে, এ পথ গোলাপ ফুল সুশোভিত! বরং এ পথ তো বিপদ সংকল ও কন্টক কির্ণ। আল্লাহ বলেন,

احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (٢) ولقد فتنا الذين من قبلهم،فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (٣)

(সূরা আনকাবুত: ২-৩)
["মানুষ কি মনে করেছে যে, তারা ঈমান এনেছে বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদেরও পরীক্ষা করেছি। অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন, কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা বলছে]
দিনের পথে আমাদের কখনো ছোট ছোট পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন দিন মানা শুরু করলে অনেকেই তাদের পরিবারের মুখোমুখি হতে হয় অনেকের সামনে তাদের পরিবার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রকৃত

মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন সাক্ষী সাক্ষীদের দ্বারা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

বিপদ কখনো আবার বড় দেখা যায়। যেমন কাউকে কাউকে জেল জরিমানা হত্যা হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। দিন অনুশীলনের পথে পরিবারের বাধা থেকেও এগুলো বড় ফিতনা। সুতরাং দিনের পর কণ্ঠ কাকীর্ণ সহজ নয়।

**চতুর্থ কারণ: নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে করা**

কিছু মানুষ ভুল করে এবং সেই ভুলকে সাধারণ বিষয় মনে করে ব্যর্থ হয় এবং সেই ব্যর্থতার স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলে ফলে তাদের সর্বদা দুর্বলতার মাঝেই থাকতে হয়। এ ধরনের ব্যক্তিকে দেখবেন কোন একটি বিষয় ব্যর্থ হয়েছে এই ব্যর্থতাকে তার সারা জীবনের উপর চাপিয়ে দেয় এবং বলে আমি তো ব্যর্থ ফলে সে হতাশা ও মানসিক দুর্বলতার বাসিত হয়।

পঞ্চম কারণ:আপন শক্তি কাজে না লাগানো

এই দিনকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে যে কি অপরিমীয় শক্তি নিহত তা আমরা এখনো জানিনা। পরি নামে আমরা দিন ছেড়ে দিয়েছি দিনের অন্তর্নিহত শক্তির খোঁজ আমরা করি না জীবনের বিস্তৃত রূপরেখা দাঁড় করানোর জন্য ইবাদাত বিধি-বিধান ও যা কিছু প্রয়োজন সবই দিনের মধ্যে রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কি কি করতে হবে সবই সুস্পষ্ট করে বর্ণ করে দেয় এই দিন।

বাস্তবিক অর্থে এই অনেক বড় ত্রুটি এই যে আমাদের কাছে আদর্শ শক্তি পৃথিবীর ধন ভান্ডার সবই আছে কিন্তু আমরা এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারি না।

সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল আপনি কোন কাজ করতে সক্ষম তারপরও সে কাজ করছেন না।

**খ) বহিরাগত কারণসমূহ:**

মানসিক বিপর্যয়ের পেছনে বহিরাগত যে কারণ গুলো মুসলিমদের প্রভাবিত করেছে সেগুলো নিজে দেয়া হলো

প্রথম কারণ: শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা

শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা এবং তাদের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জন করে তুলে ধরা। যেমন কিছু মানুষ বলে রাশিয়া ও আমেরিকার অনেক বড় শক্তি। মূলত নিজের ইয়াকিন এবং আস্থা দুর্বল হওয়ার পর আর শক্তির শক্তির সামনে এরা নিজেদের হেয় করে দেখেছে

আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وما يعلم جنود ربك الا هو

তার সৈন্যের কথা তিনি ছাড়া কেউ জানে না!।

[সূরা মুদ্দাসির: ৩১]

যদি মুসলিমরা আল্লাহর সৈন্য সীমান্তের প্রতি লক্ষ্য করতো তাহলে তারা অনুধাবন করতে পারত যে একটা মাত্র ভূমিকম্প আমেরিকার মেক্সিকো ও সান ফ্রান্সিকের মতো শহরকে মুহূর্তের দোষে দিতে পারে এবং তাদের তৈরি পারমাণবিক ক্ষমতা উল্টো তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে।“চেরনোবিল” দুর্ঘটনার কথা ভাবুন এই দুর্ঘটনায় বিরাট সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছে তারা এতটাই ভীত হয়ে পড়েছে যে এখন এই পারমাণবিক ক্ষমতার রোধ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

যে মুসলিমের আস্থা ওই ইয়াকিন আছে সে নিশ্চয়ই আল্লাহতালা সৈন্য সামন্তের কথা জানে এবং উপকরণ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় কারণ: সবকিছু পশ্চিমার লেন্সে দেখতে পছন্দ করা

পঞ্চম বাহিনী বলতে আরবিতে একটা প্রবাদ আছে মুসলিমদের মধ্যে একটা পঞ্চম বাহিনী আছে তারা মুসলিম তথা আমাদেরই সন্তান , আমাদের এই চামড়ার এবং আমাদেরই ভাষা। তারা শত্রুর কোলে লালিত পালিত হয়ে দেশে ফিরে। এসে তারা এমন সব দাবি উপস্থিত করে যা তাদের মানসিক পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মূলত তারা তাদের গায়ে পশ্চিমা ব্যক্তিত্বকে জড়িয়েছে।

## খিলাফায়ে রাশিদিনের সময় খলিফাদের দায়িত্ব:

খিলাফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কারো স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর 'খলিফা' শব্দের অর্থ প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত। 'খলিফা' শব্দের বহুবচন 'খুলাফা' এবং 'খালাইফ'। ইসলামে 'খিলাফত' এমন একটি শাসনব্যবস্থার নাম যা মহান আল্লাহর বিধান ও মহানবী সা:-এর সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত। এই শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ শাসক। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি বা খলিফা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের বিধানের অধীন। খলিফার কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদিন এবং রাসূলুল্লাহ সা:-এর সাহাবিদের সর্বসম্মত অভিমত ছিল, খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিকভাবে বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কিংবা নেতৃত্ব দেয়া তাদের মতে খিলাফত নয়, বরং

তা রাজতন্ত্র। খিলাফত ও রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবিরা পোষণ করতেন, হজরত আবু মূসা আল-আশ‘আরি রা: তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ‘খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারির জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।’ইসলামের এই খিলাফত ব্যবস্থা সর্বজনীন। আল্লাহর এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোনো ব্যক্তি, পরিবার কিংবা বিশেষ কোনো শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বা সংরক্ষিত নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁদের বিধান ও আইন মান্যকারী সব মানুষই আল্লাহর দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন।’ (সূরা আন নূর : ৫৫)। ইসলামে নবুওয়াতের পদমর্যাদার পর এই খিলাফত ব্যবস্থাই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং এ পদটি পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ পদ। বস্তুত ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তমদ্দুনিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধান এরই ভিত্তিতে হয়ে থাকে। রাসূলের কার্যাবলিকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং যেকোনো প্রকার মিশ্রণ বা ভেজাল থেকে তা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদিস হতে খলিফার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, সে আলোকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ‘খুলাফায়ে রাশেদিনই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।খুলাফায়ে রাশেদিনের মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। মহানবী মুহাম্মদ সা: তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি তাঁর আনীত আদর্শ দ্বারা জগতের শ্রেষ্ঠ একদল মানুষ বিশ্ববাসীকে উপহার

দিতে পেরেছিলেন। 'খুলাফায়ে রাশেদিন' অর্থাৎ চারজন সাহাবি তাঁদের অন্যতম। মহানবী সা:-এর পর এই চারজন সাহাবির বিশেষ মর্যাদা সংরক্ষিত। তাঁদের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে কিছু পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করা হলো।

* আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা:-এর জামানায় আমরা লোকদের মধ্যে পরস্পরকে প্রাধান্য দিতাম। আমরা হজরত আবু বকর রা:কে সবার উপরে প্রাধান্য দিতাম, তারপর হজরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা:কে এবং অতঃপর হজরত 'উসমান ইবনে আফফান রা:কে। (সহিহ বুখারি)।
* আনাস ইবন মালিক রা: বলেন, 'নবী সা: একদা হজরত আবু বকর, হজরত 'উমর ও হজরত 'উসমান রা:-সহ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদের নিয়ে (আনন্দে) দুলতে থাকে। তখন নবী সা: বললেন, 'হে উহুদ! স্থির থাক। কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ আছে।' (সহিহ বুখারি)।
* হজরত উকবা ইবন আমের রা: বলেন, মহানবী সা: বলেছেন, 'আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে উমর ইবনুল খাত্তাবই নবী হতো' (তিরমিজি)।
* হজরত 'আলী রা: বলেন, মহানবী সা: বলেছেন, 'হজরত আবু বকর এবং হজরত 'উমর রা: নবী-রাসূলগণ ছাড়া পৃথিবীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জান্নাতবাসী বয়স্ক লোকদের নেতা হবেন।' (জামে তিরমিজি)।
* হজরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: 'আলী রা:কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হজরত মূসা আ:-এর কাছে হজরত হারুন আ:-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার কাছে সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই।' (সহিহ বুখারি)।খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

খিলাফতে রাশেদার ৩০ বছর শাসনকাল (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যালোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানবজাতিকে বিমোহিত করে তা হচ্ছে :

(ক) খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল বিশ্বনবী সা:-এর পবিত্র জীবনাদর্শ উজ্জ্বল প্রদীপে পরিণত হয়েছিল এবং তা সমগ্র পরিমণ্ডলকে নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। খলিফাগণের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় তার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চারজন খলিফাই মহানবী সা:-এর একান্ত প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হজরত 'আলী রা: ছাড়া আর তিনজন খলিফাই মহানবী সা:-এর দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদিনায় রাজধানী রেখেই খিলাফতের প্রশাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন।(খ) তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন। আধুনিককালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন হলেও তখন কেবল তাঁরাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হতেন তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

(গ) খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন প্রণয়নের ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে সুষ্ঠু সমাধান বের করার চেষ্টা করা হতো এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় পারদর্শী প্রত্যেক নাগরিকেরই মতামত দেয়ার সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল।

(ঘ) খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাজকীয় ভোগবিলাস, জাঁকজমক ও শান-শওকতের কোনো স্থান ছিল না। খলিফাগণ একান্তই সাধারণ নাগরিকদের মতো জীবনযাপন করতেন। তাঁদের কোনো দেহরক্ষী ছিল না। লোকজন যখন ইচ্ছা খলিফার কাছে উপস্থিত হতে পারত।

(ঙ) খুলাফায়ে রাশেদিন বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরি ছাড়া নিজের জন্য একটি কপর্দকও কেউ ব্যয় করত।

**ঈমানী দুর্বলতার অনেকগুলো কারণ আছে; যেমন-**

এক: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা ঈমানের কমতি অবধারিত করে দেয়। কারণ যে মানুষ আল্লাহর নাম ও গুণাবলি জানে না তার ঈমানে ঘাটতি থাকে।

দুই: আল্লাহর কাউনি (চিরায়ত) ও শরয়ি নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা। এর ফলে ঈমানের কমতি ঘটে। নিদেনপক্ষে এর ফলে ঈমানে জড়তা আসে, ঈমান বৃদ্ধি পায় না।

তিন: গুনাতে লিপ্ত হওয়া। কারণ মানুষের অন্তর ও ঈমানের উপর গুনাহর অনেক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন: "কোন যিনাকারী যখন যিনা করে তখন তার ঈমান থাকে না"[সহিহ বুখারি (২৪৭৫) ও সহিহ মুসলিম (৫৭)]

চার: আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করা। কারণ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ ঈমানে কমতির কারণ। যদি অনাদায়কৃত আনুগত্যটি ফরজ শ্রেণীর হয় এবং বিনা ওজরে সেটা ত্যাগ করা হয় তাহলে এর জন্য বান্দাকে তিরস্কার করা হবে ও শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি ফরজ শ্রেণীর না হয় অথবা ওজরের কারণে ত্যাগ করে থাকে তাহলে সেটাও ঈমানের কমতি; কিন্তু এর জন্য তিরস্কার করা হবে না।[শাইখ উছাইমীনের ফতোয়া ও পুস্তিকাসমগ্র (১/৫২)]
আরো রয়েছে: যেমন:
ঈমানী দুর্বলতার কারণ:

■ ১. ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকা।

২.সৎ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি হতে দূরে থাকা।

■ ৩. শরীয়তী জ্ঞান ও ঈমানী বই হতে দূরে থাকা।

■ ৪. গুনাহগারদের মাঝে অবস্থান করা।

■ ৫. দুনইয়ার মোহে মগ্ন হওয়া।

■ ৬. ধন-সম্পদ ও পরিবার নিয়েই মেতে থাকা।

■ ৭. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বিলাসী আকাঙ্ক্ষা।

■ ৮. বেশী খাওয়া, বেশী ঘুম, বেশী কথা, অধিক রাত্রিজাগরণ, কাঠিন্যতা।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ছেড়ে দেওয়া:

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মূলভিত্তির পুরো ভাগই কোরআন এবং সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে জীবন বিধান হিসেবে তাঁর মাধ্যমে গাইড স্বরূপ দান করেছেন কোরআন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে নবিজী সুন্নাহ। এ কারণেই নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পালন ও গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা এভাবে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَ مَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا

‘আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।’ (সুরা হাশর : আয়াত ৭)

কোরআনুল কারিমের এ আয়াত ও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সুন্নাতের উপর আমল করা; সুন্নাতের

অনুসরণ ও অনুকরণ করা শুধু জরুরিই নয় বরং একান্ত আবশ্যক। কারণ কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াত ও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে অনেক হাদিসে তা প্রমাণিত। তাহলো-

১. আল্লাহ বলেন- وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٌ يُوحَىٰ

'সে (নবিজী সা.) নিজ থেকে মনগড়া কোনো কথা বলেন না। (তিনি যা বলেন) তা তো ওহি; যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' (সুরা নাজম : আয়াত ৩-৪)

২.আল্লাহ বলেন- قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ

'(হে রাসুল! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১)

৩.আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ

'যে রাসুলের আনুগত্য করলো, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।' (সুরা নিসা : আয়াত ৮০)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যদি আমরা সুন্নতকে অবহেলার কারণে আজ মুসলিম সমাজ অধঃপতনে চলে গেছে তাদের কোন কাজে বারাকা আসে না এবং সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের চুরি-ডাকাতি, মানুষকে ধোঁকাবাজি ওজনে কম দেওয়া খুন-খারাবি সবকিছুই ঘটছে।

## পশ্চিমার রীতিনীতি অনুসরণ করা

অনেকেই আছে যারা প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে অধ্যয়ন করে

তারপর দেশে ফেরার সময় তাদের পজিটিভ নেগেটিভ অনেক কিছুর সাথে করে নিয়ে আসে। এদের মাঝে মানুষের বিপর্যয়ের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা দেয়। তারা যে পজেটিভ নেগেটিভ অনেক শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে করে এনেছে এটাই তাদের বিপর্যস্ত মানসিকতার লক্ষণ এরা ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারেনি। এরা নির্ণয় করতে পারেনি যে অমুসলিমদের কাছ থেকে জাগতে কোন গ্যারান্টি নেয়া যেতে পারে এবং ভালো কোন গুন থেকে থাকলে সেগুলো কি যা আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন? সাথে সাথে তাদের কি কি কৃষ্টি কালচার ও অন্ধ অনুসরণ আছে যেগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত? তারা দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পজেটিভ নেগেটিভ এসব গ্রহণ করে। বাস্তবতা হলো পশ্চিম রা এগিয়ে আছে যন্ত্র ও প্রযুক্তিতে মানবতা দিক থেকে তারা অগ্রসর হতে পারেনি বিভিন্ন রিপোর্টে যে রেখাটি উপরের দিকে উঠে গেছে সেটা কেবল প্রযুক্তির দিক থেকে কেননা তারা প্রচুর যন্ত্র আবিষ্কার করেছে তাই যে জাতি তাদের সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করবে এবং তাদের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করবে তারা হবে মানসিকভাবে অধঃপতিত।

সুতরাং তাদের কাছে যে উন্নতি রয়েছে সেটা প্রযুক্তির উন্নতি মানবতা নয় মানবতার মাপকাঠিতে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারি কেবল আমাদের দিন মেনে চলার মধ্যে দিয়ে।

হজরত আলী (রা.) বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মতের মাঝে বারোটি (কোনো কোনো বর্ণনায় পনেরোটি) কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তখন তাদের ওপর মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কাজগুলো কী?

উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন- ১. যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে লুটের মাল মনে করা হবে...। ২. যখন আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করা হবে এবং তাতে খেয়ানত করবে। ৩. যখন লোকেরা জাকাতকে জরিমানা এবং ট্যাক্স মনে করবে। ৪. মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে অর্থাৎ মানুষ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মাকে অসন্তুষ্ট করবে। ৫. মানুষ বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং বাবার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে অর্থাৎ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে কিন্তু বাবার সঙ্গে রূঢ় ও কঠোর আচরণ করবে। ৬. মসজিদে শোরগোল হবে। ৭. সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিকে নেতা বানানো হবে। ৮. অনিষ্টের ভয়ে মানুষকে সম্মান করা হবে। ৯. ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। ১০. ব্যাপকভাবে রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে। ১১. ঘরে নর্তকী ও গায়িকা রাখা হবে এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-গানের উপকরণকে যত্নসহকারে রাখা হবে। ১২. এ উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের ওপর অভিসম্পাত করবে।

আমাদের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের জিম্মি করে ফেলেছে। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি তুলে ধলা হলো-

**মাদক** : বর্তমান যুগে সত্যিই মদকে মদ মনে করা হয় না। বিভিন্ন নাটক-সিনেমায় মদকে অত্যন্ত হালকা করে প্রদর্শন করা হয়। বাবা-ছেলে একসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে মদ খাচ্ছে, এমন চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন পার্টিতে এখন মদ রাখা স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সারা বছর মদ পান না করলেও কেউ কেউ বিভিন্ন দিবসে পার্টির নামে মদ পান করছে। প্রায় পত্রিকাগুলো খুললে রিপোর্ট পাওয়া যায়, আস্তে আস্তে নারীরাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।

**সুদ** : সুদ সমাজে এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যে, মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে- সুদবিহীন অর্থনীতি চিন্তা করা যায় না। সুদ ব্যবস্থা বন্ধ করতে গেলে

অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।' -সুরা বাকারা : ২৭৫

**ঘুষ** : যখন আমার উম্মত ঘুষকে গিফট ও উপহার বলে হালাল করবে...। কেউ কেউ ঘুষকে বলেন, স্পিড মানি। আজকাল ঘুষদাতা গিফট দিলাম বলে ঘুষ দিচ্ছে এবং ঘুষ গ্রহণকারী গিফট বলেই তা গ্রহণ করছে অথচ এটি ঘুষ। যখন আমার উম্মত জাকাতের মালকে ব্যবসার মাল রূপে গণ্য করবে তখন উম্মতের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে। এ চারটি বিষয় আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেছেন। এগুলো এখন সমাজে দেখা যাচ্ছে।

## মুসলিম উম্মার অধঃপতন থেকে উত্তরণের উপায়

সর্ব প্রথম আমাদের যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত তা হল: আমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরি এবং আমরা আমাদের দেশের মধ্যে সেই উপায়গুলোকে কাজে লাগাই যা সমাজের সমস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিশুদ্ধ তাওহীদের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাতে সবাই আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে'।

ক. হককে আঁকড়ে ধরা এবং হকের অনুসরণ করা; বেশিরভাগ মুসলমান যা করছে, সেটার অনুসরণ না করা। বেশিরভাগ মানুষই যখন হক থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং নিজে হকের ওপর অটল থাকাই বিজয়ী দলের কাজ।

খ. সুদৃঢ় আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণের আদর্শকে আবশ্যিকভাবে পালন করা এবং বিদআত ও বিদআতিদের থেকে দূরে থাকা।

গ. হিদায়াত, বাহ্যিক পরিশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধিতে অবিচল থাকা এবং পাপাচার, সন্দেহ-সংশয় ও হারাম কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকা।

ঘ. নিজের জান-মালের মাধ্যমে জিহাদ, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ এবং কর্মীদের ওপর হক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও অবিচল-অনড় থাকা।

ঙ. নিজেদের আন্দোলন-সংগ্রামের পুরোটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের বিজয়ের উদ্দেশ্যে করা। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দায়িত্ব পালন করা। বিজয়ী দলের গুণাবলি সম্পর্কিত হাদিসে এসেছে, "তারা সত্যের পক্ষে বা আল্লাহর হুকুমের পক্ষে লড়াই করতে থাকবে।" [সহিহ মুসলিম : ১৭৬; সুনানে আবু দাউদ : ২৪৮৪]

চ. ধৈর্যশীল হওয়া, ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবিলা করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী দলের বর্ণনায় বলেছেন, "যারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা এদের (বিজয়ী দলের) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং এরা বিরোধীদের কোনো পরোয়াও করবে না।" [সহিহ বুখারি : ৭৪৬০] প্রিয়নবির এ পবিত্র বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সাহায্যপ্রাপ্ত দলের এসব কর্মী নিজেদের লক্ষ্য চিনে নেবে, নিজেদের পথ বেছে নেবে এবং বিরোধীদের বিরোধিতা, পরিত্যাগকারীদের প্রতিবন্ধকতা কিংবা হিংসুক শত্রুদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। তারা ধৈর্য, স্থিরতা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করবে। [সিফাতুল গুরাবা, সালমান আল-আওদাহ : ২০৫]

সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিজয়ী দলের সাথে সম্পৃক্ত এসব গুণাবলি কোনো শ্লোগান বা দাবি নয়; বরং এগুলো বাস্তবায়ন ও কার্যে পরিণত করার বিষয়, তাদের শরয়ি গুণাবলি নিশ্চিত করার বিষয় এবং তাদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করার বিষয়। যে এসব গুণ অর্জন করে নেবে এবং দায়িত্ব পালন করবে, সে-ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও সে একা হয়। আল্লাহ বলেন, "হে ইমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা বলো কেন? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। যারা

আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।” [সুরা সফ : ২-৪]

ছ. কোরআন অধ্যায়ন:এই মরণঘাতী ব্যাধি ও বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হিসাবে আমাদের মুসলিম সমাজকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ফিরে আসতে হবে। তারা ইসলামী বিধানকে নিজেদের জীবনে অবশ্য পালনীয় করে নিবে। তারা বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে।

জ. সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গড়া:আমাদেরও সকলের কর্তব্য হবে ক্কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেয়া ও এ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাহকে সবকিছুর উপর স্থান দেয়’।[১৭]

ঝ. শুনলাম মোতাবেক দৈনন্দিন আমল করা সেই অনুযায়ী জীবনকে সুন্দর মত গড়ে তোলা বেলায়েত থেকে দূরে থাকা। কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রিসার্চ করা। সহি হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান নেওয়া। সে মোতাবেক রাষ্ট্র গঠন করা।

ঞ. সিরাত সম্পর্কে জানা: সিরাজ সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কিভাবে জীবন যাপন করেছে। কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে কিভাবে ন্যায় বিচার করেছে এবং সে আমাদেরকে কি আদেশ দিয়েছে কি নিষেধ করেছে এবং কি করলে আমাদের জন্য আখিরাতে ভালো হবে এবং কি করলে আমাদের সমাজের শান্তি বজায় থাকবে সবকিছু আমাদের সিরাতের দেয়া আছে সেখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং আমাদের সন্তানাদি এদেরকে জ্ঞান দিতে হবে এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে সিরাত নিয়ে পড়াশোনা করা এবং করা নিয়ে পড়াশোনা করার যাতে করে আমাদের সমাজকে এই অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

ট.ফিতনা থেকে বাঁচা :আমরা এখন হয়ত সেই যুগেই পদার্পণ করছি। কোথাও কোনো শান্তি নেই। সবাই পাপের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। অনিয়মই হয়ে যাচ্ছে নিয়ম। ধর্মভীরুতা হয়ে যাচ্ছে আনস্মার্টনেস। কঠিন কবিরা গোনাহের কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে প্রগতিশীলতা। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, গিবত সবই এখন নিত্যদিনের কাজ। এখন মানুষ গোনাহকে আর গোনাহ মনে করে না- নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর নাফরমানি করাই হয়ে উঠছে ফ্যাশন। যার কারণ বিশ্বব্যাপী নেমে এসেছে বিপর্যয়। এই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে আমাদের আবারও ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর দেখানো পথে।

এখনই নিজেদের সংশোধন করতে হবে, যাবতীয় গোনাহ থেকে বিরত থেকে সর্বদা আল্লাহর দরবারে তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। চোখের গোনাহ, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, সুদ ও ঘুষের গোনাহ থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে সর্বদা নিজ পরিবার-পরিজন ও বন্ধু মহলকে সতর্ক করতে হবে। সেই সঙ্গে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রিয় নবী (সা.) স্বীয় উম্মতদের এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফিতানি, মা-জহারা মিনহা ওয়া মা বাতানা।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা থেকে পরিত্রাণ চাই।' -মুসনাদে আহমাদ

## উপসংহার:

আল্লাহ তা‘আলার স্থায়ী নিয়ম হল- আল্লাহর বাণী: مَا يَفۡعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمۡ اِنۡ شَكَرۡتُمۡ وَ اٰمَنۡتُمۡ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيۡمًا ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? বস্তুত আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ’ (সূরা আন-নিসা: ১৪৭)। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা বিনা কারণে কাউকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেন না। মানুষ ঈমান থেকে ফিরে গেলে কিংবা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তা‘আলা শাস্তি দিয়ে থাকেন।

সুধী পাঠক! ‘মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তির কারণ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখতে পেলাম যে, মুসলিমদের এই অধঃপতন ও দুরাবস্থা খামোখা হয়নি। বরং এর নেপথ্যে শরী‘আত সম্মত কারণ আছে। সেগুলো হল- (১) শিরকে নিমজ্জিত হওয়া। (২ ও ৩) কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত থেকে বিমুখতা। (৪) দুনিয়ার মোহ-মায়ায় মোহান্ধ। (৫) দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিরত থাকা। (৬) মুসলিম উম্মাহর বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং এই বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে শিরকমুক্ত জীবন-যাপনের অভ্যস্ত হতে হবে, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং এর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দুনিয়ার মোহ-মায়া ত্যাগ করে পরকাল সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং যে কোন মূল্যে মুসলিম সমাজে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে উপরিউক্ত ছয়টি কর্মের বিনিময়ে দুনিয়ার সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আল্লাহুম্মা আমীন!!